بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ২৬ সুলাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

(উহুদের) যুদ্ধে মহানবী (সা.) যে আঘাত পেয়েছিলেন এসংক্রান্ত কতক বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-র রেওয়ায়েত অনুয়ায়ী, ঐ সময় মহানবী (সা.) বলেছেন, اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ على مَن قَتَلَهُ النبيُّ في سَبيلِ اللَّهِ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ على قَوْمٍ دَمَّوْا وجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ- **(উচ্চারণ: ইশতাদ্দা গাযাবুল্লাহি আ'লা মান কাতালাহুন্ নাবীয়্যু ফী সাবিলিল্লাহি, ইশতাদ্দা গাযাবুল্লাহি আ'লা কওমীন দাম্মাও ওয়াজহা নাবীয়্যিল্লাহ্)**। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির প্রতি চরম ক্রোধান্বিত হন যাকে আল্লাহ্র নবী (সা.) আল্লাহ্র পথে হত্যা করেন এবং আল্লাহ্র ক্রোধ ঐ জাতির জন্য কঠোররূপে মূর্ত হয় যারা আল্লাহ্র নবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলকে রক্তে রঞ্জিত করেছে।

তিবরানীর রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) যখন (গুরুতর) আহত হন তখন তিনি বলেন, إشتدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ كَلَمُوا وجهَ رسولِ اللهِ (উচ্চারণ: **ইশতাদ্দা গাযাবুল্লাহি আ'লা কওমীন কালামূ ওয়াজহা রসূলিল্লাহ্)**। অর্থাৎ, সেই জাতির ওপর আল্লাহ্র কোপানল অতি কঠিন রূপ ধারণ করে যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা অবুঝ। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বিবরণও এটিই যে, মহানবী (সা.) বার বার বলছিলেন, **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা অবুঝ। কাজেই, তাঁর দয়া যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার রঙে রঙিন ছিল তা এমন অবস্থায়ও উদ্বেলিত হয় যখন তিনি (সা.) গুরুতর আহত ছিলেন, (শরীর থেকে) রক্ত ঝরছিল। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার নবীর ওপর অত্যাচার করে এবং তাঁর প্রেমাস্পদের ওপর নিপীড়ন চালায় তখন আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ প্রকাশ পায়। কিন্তু তিনি (সা.) এই দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! এরা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এই অত্যাচার করছে, এদের তুমি ক্ষমা করে দাও**। তাদের ভুলের কারণে তুমি তাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ কোরো না। **আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদীন ওয়া আ'লা আলে মুহাম্মাদীন**। স্নেহ ও দয়ার কত মহান বহিঃপ্রকাশ।

সহীহ্ বুখারীতে এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

(উচ্চারণ: **ক্বালা আব্দুল্লাহি কাআন্নি আনযুরু ইলান্ নাবীয়্যে ইয়াহকি নবীয়্যান মিনাল আমবিয়ায়ে যারাবাহু ক্বওমুহু ফাআদমাওহু ওয়া হুয়া ইয়ামসাহুদ্ দামা আন ওয়াজহিহী ওয়া ইয়াকুলু আল্লাহুম্মাগফির লিক্বওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন**)।

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যেন এখনও মহানবী (সা.)-কে দেখছি, তিনি নবীদের মধ্য হতে একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছেন যাকে তাঁর জাতির লোকেরা মারতে মারতে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছিল আর তিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত পরিষ্কার করতে করতে বলছিলেন, **"হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা জানে না (তারা কী করছে)।"**

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বিস্তারিত লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) গিরিপথে পৌঁছে হযরত আলী (রা.)-র সাহায্যে নিজের ক্ষতস্থান ধৌত করেন এবং তাঁর গালে যে দুটি আংটা ঢুকে গিয়েছিল তা হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) অনেক কষ্টে নিজের দাঁত দিয়ে টেনে বের করেন। এ প্রচেষ্টায় তার দুটি দাঁতও ভেঙে গিয়েছিল। এ সময় তাঁর ক্ষতস্থান থেকে অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আর এই রক্ত দেখে তিনি (সা.) পরিতাপের সাথে বলছিলেন, كيف يُفلِحُ قومٌ خَضَبوا وَجْهَ نبيِّهم بالدَّمِ، وهو يَدعوهُم إلى رَبِّهم **(উচ্চারণ: কাইফা ইয়ুফলিহু ক্বওমুন খাযাবূ ওয়াজহা নাবীয়্যিহিম বিদ্‌দামে ওয়া হুয়া ইয়াদউহুম ইলা রাব্বিহিম)**। সেই জাতি কীভাবে মুক্তি পাবে যারা নিজেদের নবীর মুখমণ্ডলকে শুধু এই অপরাধে তাঁরই রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন? এরপর তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ**। অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কেননা অজ্ঞতার কারণে এবং না জেনে তাদের দ্বারা এই অপরাধ হয়ে গেছে**। রেওয়ায়েতে এসেছে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ। অর্থাৎ, শাস্তি এবং ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে, এতে তোমার কোনো ভূমিকা নেই। খোদা তা'লা যাকে চাইবেন ক্ষমা করে দিবেন আর যাকে চাইবেন শাস্তি দিবেন। এরপর লিখেছেন, ফাতেমাতুয্ যাহরা (রা.) যিনি মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভয়ংকর সংবাদ শুনে মদীনা থেকে ছুটে এসেছিলেন, তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে উহুদের প্রান্তরে পৌঁছে যান আর পৌঁছামাত্রই তাঁর (সা.) ক্ষতস্থান ধৌত করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রক্তপ্রবাহ কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে হযরত

ফাতেমা (রা.) চাটাইয়ের একটি টুকরা পুড়িয়ে এর ছাই তাঁর ক্ষতস্থানে বেঁধে দেন, তখন গিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অন্যান্য নারীরাও এসময় আহত সাহাবীদের সেবা-শুশ্রূষা করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে আর এর আংটা মহানবী (সা.)-এর মাথায় বিদ্ধ হয়। মহানবী (সা.) অচেতন হয়ে সেই সাহাবীদের (মৃতদেহের) ওপর পড়ে যান যারা তাঁর আশেপাশে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আরও কয়েকজন সাহাবীর মৃতদেহ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহের ওপর পড়ে। লোকেরা ধরে নেয়, তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু যখন তাঁকে গর্ত থেকে তুলে আনা হয় আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি (সা.) একথা চিন্তাতেই আনেন নি যে, শত্রুরা আমাকে আহত করেছে, আমার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে শহীদ করে দিয়েছে; বরং তিনি (সা.) চেতনা ফিরে পেতেই এই দোয়া করেন, رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (অর্থাৎ) **"হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এই লোকেরা আমার পদমর্যাদাকে চিনতে পারে নি, তাই তুমি তাদের মার্জনা করো এবং তাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও।"**

উহুদের যুদ্ধে ফেরেশতাদের আগমন এবং তাদের যুদ্ধ করার ব্যাপারেও উল্লেখ পাওয়া যায়। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমি মহানবী (সা.)-এর ডানে এবং বামে দুই ব্যক্তিকে দেখেছি; তারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং তুমুল যুদ্ধ করছিলেন। আমি এই দুজনকে পূর্বে কখনো দেখি নি আর পরবর্তীতেও কখনো দেখি নি; অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ.) ও মিকাঈল (আ.); আর এটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদও বর্ণনা করেছেন। (তারা) বলেন, ফেরেশতারা কেবল বদরের দিন লড়াই করেছিলেন। বায়হাকী বলেন, তার বক্তব্যের মর্ম হলো, মুসলমানরা যখন মহানবী (সা.)-এর অবাধ্যতা করে এবং তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকে নি তখন আর ফেরেশতারা যুদ্ধ করেন নি। {এটি গিরিপথে নিয়োজিতদের প্রতি ইঙ্গিত, অর্থাৎ যখন তারা আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন আর অবিচল থাকেন তখন ফেরেশতারা (তাদের) সুরক্ষা করছিলেন। আর যখন তারা অধৈর্য প্রদর্শন করে তখন ফেরেশতারাও তাদের নিরাপত্তার ছায়া তুলে নেয়। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন।}

এ সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন উমর তার শিক্ষকদের বরাতে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا (আয়াত) সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেন যে, তারা অবিচল থাকে নি বরং পলায়ন করেছিল; তাই তাদের সাহায্য করা হয় নি। আর তার বরাতে এই রেওয়ায়েতও করা হয়েছে যে, তার শিক্ষকরা বলেছেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) শহীদ হয়ে গেলে তার আকৃতি ধারণ করে একজন ফেরেশতা

পতাকা আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং সেইদিন ফেরেশতারা উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা যুদ্ধ করেন নি।

হারেস বিন সিম্মা (রা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন, উহুদের দিন মহানবী (সা.) গিরিপথে ছিলেন। তিনি (সা.) আমাকে আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন আমি নিবেদন করি, আমি তাকে পাহাড়ের কাছে দেখেছিলাম। তখন তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা তার সাথে যুদ্ধ করছে। হারেস বলেন, এরপর আমি আব্দুর রহমানের কাছে ফিরে যাই। তখন আমি তার সামনে সাতজন কাফিরকে মৃত অবস্থায় দেখি। তখন আমি বললাম, আপনার ডান হাত সফল হয়েছে! এদের সবাইকে আপনি হত্যা করেছেন? তিনি বলেন, এই দুজনকে আমি হত্যা করেছি। আর এদেরকে এমন ব্যক্তি হত্যা করেছে যাকে আমি দেখি নি। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে সত্য বলেছেন, অর্থাৎ ফেরেশতারা তার সাথে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করছিল। ইবনে সা'দ আব্দুল্লাহ্ বিন ফযল বিন আব্বাসের বরাতে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উহুদের দিন আল্লাহ্র রসূল (সা.) মুসআব বিন উমায়েরকে পতাকা দান করেন। এরপর মুসআব শহীদ হয়ে যান। তখন এই পতাকাটি মুসআব-এর চেহারাধারী একজন ফেরেশতা ধরে ফেলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে মুসআব, সামনে অগ্রসর হও। তখন সেই ফেরেশতা তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলেন, আমি মুসআব নই। তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) বুঝতে পারেন, তিনি একজন ফেরেশতা যার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র রসূল (সা.) উহুদের দিন বলেন, হে মুসআব! তুমি সামনে অগ্রসর হও। তখন আব্দুর রহমান বিন অউফ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মুসআবকে তো শহীদ করা হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই, কিন্তু একজন ফেরেশতা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তার নাম তাকে দেওয়া হয়েছে। আল্লামা ইবনে আসাকির, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি নিজেকে দেখেছি যে, আমি তির নিক্ষেপ করছি আর সেই তিরগুলোকে আমার কাছে সাদা কাপড় পরিহিত সুদর্শন ব্যক্তি ফেরত নিয়ে আসছিল। আমি তাকে চিনতে পারি নি, যেকারণে আমার ধারণা হয়, সে ফেরেশতা ছিল।

উমায়ের বিন ইসহাক হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন লোকেরা আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছ থেকে দূর ছিটকে পড়ে। আর সা'দ তাঁর (সা.) সামনে তিরন্দাজি করতে থাকেন এবং একজন যুবক তাকে তির উঠিয়ে দিচ্ছিল। তিনি যখনই তির নিক্ষেপ করতেন, সে তা উঠিয়ে নিয়ে আসত। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু ইসহাক, তোমার তির চালাও। যখন তিনি যুদ্ধ শেষ করেন তখন সেই যুবককে কোথাও দেখতে পান নি আর কেউ তাকে চিনতও না।

আল্লামা বায়হাকী, উরওয়া থেকে আল্লাহ্ তা'লার বাণী وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য এবং তাকওয়ার শর্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ক্রমাগতভাবে আগমনকারী ৫ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করবেন, আর আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই করেছেন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেছে আর সারি ত্যাগ করেছে এবং তিরন্দাজরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ– 'নিজ অবস্থান থেকে সরবে না'– এটি অমান্য করল এবং জাগতিক বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা করল তখন ফেরেশতা সাহায্য প্রত্যাহার করল। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ (সূরা আলে ইমরান: ১৫৩)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে কৃত স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, যখন তোমরা তাঁর আদেশে তাদের মূলোৎপাটন করছিলে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন আর তাদেরকে বিজয় দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা আদেশ অমান্য করে তখন তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও নিজের এক খুতবায় এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধে যে ফেরেশতাদের দেখা গেছে তাদের মাথায় কালো রঙের পাগড়ি ছিল এবং তাদের একটি উর্দি ছিল। সাহাবীরা যখন সেই ফেরেশতাদের দেখেন তখন তারা সেভাবেই মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত ছিল। যখন বিভিন্ন রেওয়ায়েত সংকলন করা হয় তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যান। কিন্তু যেমনটি মহানবী (সা.) مُسَوِّمِينَ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন তেমনটিই নির্ধারিত ছিল আর হুবহু তা-ই হয়েছে। অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধে যে ফেরেশতাদের দেখা গেছে তাদের মাথায় প্রতীক স্বরূপ লাল পাগড়ি ছিল। লাল রঙের মাঝে কিছুটা দুঃখের বার্তাও ছিল। কেননা উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর আহত হওয়ার কারণে যতটা দুঃখ সাহাবীরা পেয়েছিলেন তেমন কষ্ট মহানবী (সা.)-এর পুরো জীবদ্দশায় সাহাবীদের কখনো হয় নি। এক দুঃখের পর তারা অপর কষ্টের সংবাদ পান আর এই শোকে তারা মুহ্যমান ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই যুদ্ধে ফেরেশতাদের প্রতীক হিসেবেও এমন একটি রঙ বাছাই করা হয়েছে যার মাঝে দুঃখ, রক্ত এবং কষ্টের দিকটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ লাল রঙ।

সাহাবীদের অবিচলতা ও আত্মবিলীনতারও অনেক ঘটনা রয়েছে যে, তারা কীভাবে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধানে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। হযরত আনাস বিন নযর আনসারী (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়; হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার চাচা হযরত আনাস বিন নযর (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন তাতে আমি অনুপস্থিত

ছিলাম। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তৌফিক দেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই দেখবেন– আমি কী করি। অতএব যখন উহুদের দিন আসে আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলমানরা পিছু হটে তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তারা যা করেছে আমি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। (তিনি মুসলমানদের কথা বলছিলেন যারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।) এরপর বলেন, আমি তোমার কাছে দায়মুক্তি প্রকাশ করছি তা থেকে যা তারা করেছে বা যা মুশরিকরা করেছে। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং হযরত সা'দ বিন মুআযের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বলেন, হে সা'দ বিন মুআয! জান্নাত। এরপর বলেন, নযরের খোদার কসম! আমি উহুদের দিক থেকে এর (অর্থাৎ জান্নাতের) সুঘ্রাণ পাচ্ছি। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এরপর তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারি নি। (অর্থাৎ, তিনি এই ঘটনা মহানবী (সা.)-এর কাছে বিবৃত করছিলেন।) তিনি বলেন, তিনি যেমন বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন আমি তা করতে পারি নি। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা তার দেহে আশিটির কিছু অধিক তরবারির অথবা বর্শা ও তিরের আঘাত দেখেছি। আর আমরা যখন তাকে পাই তখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আর মুশরিকরা তার লাশ বিকৃত করেছিল। তার আপন বোন ছাড়া তাকে কেউ চিনতে পারে নি। তিনি আঙ্গুলের ডগা দেখে হযরত আনাস (বিন নযর)-কে শনাক্ত করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা জানতাম অথবা তিনি বলেছেন, আমরা মনে করতাম, এই আয়াত তার এবং তার মতো অন্যদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (সূরা আল্ আহযাব: ২৪)

অর্থাৎ, এই মু'মিনদের মাঝে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, আনাস বিন মালেকের চাচা আনাস বিন নযর, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং উমর বিন খাত্তাব (রা.) প্রমুখ মুহাজির ও কতিপয় আনসারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; তারা সবাই বসে ছিলেন। আনাস (রা.) তাদের বলেন, তোমরা বসে আছ কেন? তারা বলেন, মহানবী (সা.) তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আনাস (রা.) তখন বলেন, তাহলে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তোমরা জীবিত থেকে কী করবে? যেভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন সেভাবে তোমরাও মৃত্যুকে বরণ করে নাও! এরপর আনাস (রা.) কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আর এমনভাবে লড়াই করেন যে, অবশেষে শহীদ হয়ে যান। তার নামেই আনাস বিন মালেকের নাম রাখা হয়েছে।

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, সেদিন আমরা আনাস বিন নযরকে এ অবস্থায় পাই যে, তার শরীরে সত্তরটি আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তার বোন ছাড়া কেউ তার লাশ চিনতে পারে নি। তিনি তার আঙুলের ডগা দেখে তাকে চিনেছেন।

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, সেসময় ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল এবং মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার মুহূর্ত ছিল আর মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে অনেক সাহাবী মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাঠের একদিকে বসে পড়েছিলেন। তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)-ও ছিলেন। অতএব এসব লোকেরা এভাবে রণক্ষেত্রের একদিকে বসে ছিলেন আর তখন এক সাহাবী আনাস বিন নযর আনসারী আসেন এবং তাদেরকে দেখে বলেন, তোমরা এখানে কী করছ? তারা উত্তর দিল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শাহাদত বরণ করেছেন; এখন আর যুদ্ধ করে কী লাভ? আনাস বলেন, এখনই তো যুদ্ধ করার সময় যেন মহানবী (সা.) যে মৃত্যু লাভ করেছেন তা আমাদের কপালেও জোটে। এছাড়া তাঁকে ছাড়া জীবনের কী-ইবা আনন্দ! অতঃপর তাদের সামনে সা'দ বিন মুআয আসেন। তখন তিনি বলেন, সা'দ! আমি তো পাহাড় থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এটি বলে আনাস শত্রুসারিতে ঢুকে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর তার শরীরে আশিটির বেশি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং কেউই চিনতে পারছিল না যে, এটি কার লাশ? অবশেষে তার বোন আঙুল দেখে তাকে চিহ্নিত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও এ বিষয়ে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন হযরত আনাস (রা.)-র চাচাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। প্রচণ্ড লড়াই করেন এবং মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের আক্রমণ থেকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষার চেষ্টা করেন। পরিশেষে বিজয় লাভ হয়। বিজয় লাভের পর মুসলমানরা শত্রুদের বন্দি করা ও তাদের মালামাল একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নির্বোধ শত্রুরা এটিকে লুটপাট বলে অভিহিত করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যুদ্ধশেষে যখন তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করছিলেন তখন শত্রুরা সেটির নাম লুটপাট রেখেছিল। অথচ এটি লুটপাট হয় না বরং শত্রুদের দুর্বল করার একটি মাধ্যম হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি মনে করেন যে, এখন আমার দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ক্ষুধা লেগেছিল এবং কিছু খেজুর তার কাছে ছিল। তাই তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছুটা পিছনে সরে গিয়ে বিজয়-উল্লাসে মেতে ওঠেন এবং খেজুর খেতে থাকেন। খেজুর খেতে খেতে পায়চারি করতে করতে একদিকে এসে দেখেন, হযরত উমর (রা.) একটি পাথরের ওপরে বসে কাঁদছেন। তিনি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান এই ভেবে যে, আজ তো হাসি-আনন্দের দিন, অভিনন্দনের দিন। এমন অবস্থায় ইনি কাঁদছেন কেন? অতএব তিনি হযরত উমর (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন, আরে ভাই! আজ তো আনন্দের দিন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন আর তুমি এখন কাঁদছ! হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি সম্ভবত জানো না যে, বিজয়ের পর কী হয়েছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? হযরত উমর (রা.) বলেন, শত্রুবাহিনী পিছন থেকে আসে এবং পুনরায় আক্রমণ করে, যার ফলে ইসলামী বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং মহানবী (সা.) শহীদ হন। সেই আনসারী বলেন, উমর! তবুও

তো এটি কান্নার সময় নয়। একটি খেজুর তার হাতে রয়ে গিয়েছিল। তিনি সেটিকে তৎক্ষণাৎ ফেলে দেন এবং খেজুরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার এবং আমার খোদার মাঝে একটি খেজুর ছাড়া আর কী প্রতিবন্ধকতা আছে? অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা.)-র দিকে তাকান এবং বলেন, উমর! মহানবী (সা.) যদি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে এ পৃথিবীতে আমাদের (বেঁচে থেকে) কী লাভ? সুতরাং তিনি যেখানে গিয়েছেন আমরাও সেখানেই যাব! একথা বলেই তিনি তরবারি ধারণ করেন আর একাই হাজার হাজার শত্রুর ওপর হামলে পড়েন। হাজার হাজার সংখ্যার বিপরীতে একজন লোকের ক্ষমতাই বা কী? চতুর্দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ হয় ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তার মরদেহ খোঁজ করতে বলেন তখন তার দেহের সত্তরটি খণ্ড পাওয়া যায়; বরং কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার লাশ শনাক্তই করা যাচ্ছিল না। অবশেষে তার এক বোন বা অন্য কোনো আত্মীয় তার আঙ্গুলের একটি চিহ্ন দ্বারা তাকে শনাক্ত করেন।

এ ঘটনাটি অপর একস্থানে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের গুজব রটে তখন তিনি অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.)-র চাচা হযরত উমর (রা.)-কে একটি টিলাতে বসে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, উমর! মুসলমানরা যেখানে (যুদ্ধে) জয় লাভ করেছে সেখানে (তোমার) কাঁদার কারণ কী? হযরত উমর জবাবে বলেন, তুমি কি জানো না, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন? হযরত আনাস (রা.)-র চাচা যখন এ সংবাদ শুনেন তখন তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন আর তাঁর হাতে একটি খেজুরই অবশিষ্ট ছিল। সেই খেজুরটি ছুঁড়ে ফেলে দেন আর বলেন, আমার ও আল্লাহ্ তা'লার মধ্যখানে এটি ছাড়া আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। রসূলপ্রেমে তিনি হযরত উমর (রা.)-র দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকান এবং বলেন, উমর! মহানবী (সা.) যেখানে পরপারে চলে গিয়েছেন তাহলে তুমি এখানে বসে বসে কাঁদছ কেন? তিনি (সা.) যেখানে চলে গিয়েছেন আমিও সেখানেই যাচ্ছি! আর অমনি একাই তিন হাজার শত্রুর ওপর হামলে পড়েন। কাফিররাও সম্ভবত তাঁকে বদ্ধ উন্মাদ মনে করে থাকবে। তিনি লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন। আর যুদ্ধ শেষে যখন লাশ সন্ধান করা হয় তখন তাঁর দেহের সত্তরটি খণ্ড পাওয়া যায়। দেহের প্রতিটি অংশ পৃথক হয়ে গিয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত তাঁর শাহাদতের কথা বর্ণনা করেছেন। কোথাও বিস্তারিত, কোথাও আবার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। একস্থানে তিনি বর্ণনা করেন: একটি হাদীসে রয়েছে, একজন আনসারী সাহাবী হযরত মালিক বিন আনাস (রা.) ভুলক্রমে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি যখন বদরী সাহাবীদের মুখে বদরের যুদ্ধের কৃতিত্ব শোনেন তখন উত্তেজনায় পায়চারি করতে থাকেন আর বলেন, এ কী কথা! সুযোগ পেলে আমিও দেখাব যে, মু'মিন কেমন কুরবানী করে! অতঃপর তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পিছন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণের ফলে মুসলমানরা যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন কিছুক্ষণের জন্য তারা রণাঙ্গন ছেড়ে বাইরে চলে যায় আর মহানবী (সা.) একা হয়ে যান এবং কাফিরদের প্রস্তরাঘাতের আহত হয়ে অন্য আহত

ব্যক্তিদের মাঝে পড়ে যান, ইতঃমধ্যে আরো কিছু লোক আহত হয়ে তাঁর (সা.) ওপর পড়ে যায়, তখন কয়েক মিনিট পর মানুষজন তাঁকে (সা.) দেখতে না পেয়ে মনে করে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তখন কতক ব্যক্তি ছুটে গিয়ে উহুদ প্রান্তরের অদূরে মদীনাতে গিয়ে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। সংবাদটি রণাঙ্গনের অদূরে থাকা লোকজনের জন্য বজ্রপাতের ন্যায় ছিল। তাঁদের মাঝে হযরত উমর (রা.)-ও ছিলেন। তিনি একটি পাথরের ওপর বসে কাঁদছিলেন, তখনই মালিক বিন আনাস (রা.) যিনি যুদ্ধের পূর্বে খাবার খান নি, দু-তিনটি খেজুর খেতে খেতে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যেহেতু সেসময় রণাঙ্গন থেকে বেরিয়েছেন যখন কিনা মুসলমানরা জয় লাভ করেছিল আর কাফিররা পরাজিত হয়েছিল, পক্ষান্তরে হযরত উমর তখন রণাঙ্গন থেকে এসেছিলেন যখন শত্রুপক্ষ পিছন থেকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ রচনা করেছিল আর মহানবী (সা.) আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন এবং কিছু সাহাবী ভেবেছিলেন, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন– এজন্য তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) তখন কাঁদছিলেন। অপরদিকে মালিক আনন্দিত ছিলেন একারণে যে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে। সুতরাং তার কান্নাকাটি দেখে মালিক অবাক হন এবং তিনি বিস্ময়ের সাথে হযরত উমরকে দেখতে থাকেন ও বলেন, হে উমর! এটি কি খুশির সময় নাকি কান্নার? আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন, আমাদের তো আনন্দ করা উচিত। হযরত উমর (রা.) মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, মালিক, তুমি হয়ত জানো না যে, পরবর্তীতে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে গেছে। শত্রুরা পাহাড়ের পিছন থেকে এসে পুনরায় আক্রমণ করেছে এবং আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ইসলামী সেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এবং মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। তখন মালিকের হাতে শেষ খেজুরটি ছিল। তিনি খেজুরটি উঠিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন আর বলেন, আমি ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে এ খেজুর ছাড়া আর কোনো বাধা আছে কি? অতঃপর হযরত উমরকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবুও এটি কান্নার কোনো সময় নয়। আমাদেরও সেখানে যাবার প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন যেখানে আমাদের প্রেমাস্পদ গিয়েছেন। এই বলে খাপ থেকে তরবারি বের করলেন এবং বিশাল শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একা একজন মানুষ শত-সহস্র মানুষের মোকাবিলা কীভাবে করবে? কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদের বিজয়ী করলেন তখন মহানবী (সা.) বললেন, মালিক বিন আনাসকে সন্ধান করো, সে কোথায়? সবাই এসে সংবাদ দিল, তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি (সা.) পুনরায় তাকে খুঁজে আনার নির্দেশ দিলেন। ইতঃমধ্যে তার বোন মদীনা থেকে মহানবী (সা.)-এর শহীদ হবার উদ্বেগজনক সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান এবং অবশেষে একস্থানে তিনি একটি লাশের কিছু টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন, যে টুকরোগুলোর একটি আঙুল দেখে তিনি চিনতে পারেন, এটি তার ভাই মালিকের লাশ এবং মহানবী (সা.)-কে সেই সংবাদ দেন।

এই ছিল মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের রসূলপ্রেম। ধারাবাহিক যে বর্ণনা চলছে তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আপনাদের দোয়ায় ইয়েমেনের আহমদীদেরও স্মরণ রাখবেন। তারা বর্তমানে ভীষণ সমস্যা কবলিত। অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্যেও একতা ও ঐক্য সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দিন। বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। পরিস্থিতি দ্রুত যুদ্ধের দিকে গড়াচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

আমি নামাযের পর দুজন প্রয়াত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে সিয়েরা লিওনের নায়েব আমীর মোকাররম হাফেয ডাক্তার আব্দুল হামীদ গুমাঙ্গা সাহেবের। তিনি গত ১৩ই জানুয়ারি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন।

সিয়েরা লিওন জামা'তের আমীর মূসা মেওয়া সাহেব তার ব্যাপারে লিখেছেন, ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেব সিয়েরা লিওনে সর্বাধিক পরিমাণ ওসীয়্যতের চাঁদা আদায়কারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন সবার কাছে নতুন জলসাগাহ্ ক্রয়ের এবং সে উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করি তখন ডাক্তার সাহেব সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করেন এবং তার মৃত্যুর পূর্বে দশ হাজার আমেরিকান ডলার অনুদান পরিশোধও করেন। ডাক্তার সাহেব নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে পাঁচ বছর ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। নাইজেরিয়াতে তার পোস্টিং হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কাগজপত্র সম্পূর্ণ হয় নি। ইতঃমধ্যে আমাদের একজন পাকিস্তানি ডাক্তার যাবার কারণে তিনি ফ্রি-টাউনের হাসপাতালেই সেবা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন এবং সেখানে তিনি খুব নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময়ে হাসপাতাল থেকে তার আয়ের প্রাপ্ত অংশ হাসপাতালকে দিয়ে দেন এবং হাসপাতালের সৌন্দর্যবর্ধন ও সংস্কারের কাজ করিয়েছেন। স্থানীয় মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ লিওন। খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ছিল। তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আক্ষেপ যার জন্য তিনি আফসোস করতেন তা হলো, যুগ-খলীফার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় নি। আমার সাথে তিনি সাক্ষাতের দুবার চেষ্টা করেছেন; অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি ভিসা পান নি। ডাক্তার হিসেবে তিনি অভাবী রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। এমন অনেক ছাত্র যাদের পিতা-মাতা তাদের কলেজের ফিস দিতে পারতেন না তাদেরকে ডাক্তার সাহেব সাহায্য করতেন। খুব সৎ, পরিশ্রমী এবং পরোপকারী ছিলেন। লন্ডনের টমী কালোন সাহেবের ছোটো বোন দিয়া ইয়াদা কামাঙ্গা সাহেবার সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দুটি ছোটো ছোটো সন্তান রয়েছে যাদের একজনের বয়স তিন বা চার বছর এবং অপরজনের দুই বছর; অর্থাৎ এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে।

সেখানকার মুরব্বী সাঈদুল হাসান শাহ্ বলেন, তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন যা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। নতুন আমীর মূসা মেওয়া সাহেবের টিমের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেব। কেনিয়া থেকে গাইনোকোলজিতে বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করে তিনি সিয়েরা লিওনে আসেন। তার এক বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। অহর্নিশি পরিশ্রম করতেন এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা হয়ত তার জন্য অপেক্ষা করছে– একথা তিনি ভুলে যেতেন। তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেযও ছিলেন এবং খুব সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, গত রমযানে কেন্দ্রীয় জামা'তে তিনি তারাবীহ্র নামাযও পড়ান এবং মানুষ খুব উপভোগ করে। বিনয় ডাক্তার সাহেবের এক উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল। সদা হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন এবং নিজের অসুস্থতা ও কষ্ট লুকিয়ে রাখতেন।

মুরব্বী সিলসিলাহ্ সাফীর আহমদ সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। এলাকায় স্বনামধন্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে আরোগ্য রেখেছিলেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আসত তখন তিনি তাদের দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও করতেন এবং তাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করতেন। মরহুম নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। সময়মতো চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করতেন। জামা'তের কাজের জন্য নিজের জাগতিক কাজ পরিত্যাগ করে জামা'তের ডাকে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতেন। জামা'তের কর্মকর্তা এবং মুরব্বীদের অশেষ সম্মান করতেন। জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন এবং সকল ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে পোর্টলোকো মসজিদে জুমুআর নামায পড়ার জন্য আসতেন।

দ্বিতীয় নায়েব আমীর আব্দুল হাই করোমা সাহেব বলেন, ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেব সিয়েরা লিওনের স্থানীয় ভাষা মেন্ডেতে কুরআন অনুবাদ কমিটির সদস্যও ছিলেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায়কারী ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রকৃত অর্থে তিনি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। সরকারি দায়িত্ব পালন শেষে আহমদীয়া হাসপাতালে যেতেন এবং মাগরিব পর্যন্ত সেখানে কাজ করতেন আর এরপর মিশন হাউজ যেতেন। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন, এরপর বাড়ি যেতেন। প্রায়শ তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং এর সত্যতাও প্রকাশ পেত। তিনি বলেন, যুগ-খলীফার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জামা'তের জন্য দশ বছর মেয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যেন ভবিষ্যতে জামা'তের জন্য কর্মীবাহিনী সামনে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, নায়েবে আমীর হিসেবে তার সাথে এ অধমের গভীর সম্পর্ক ছিল। জামা'তের প্রতি আন্তরিকতা আর আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার অধিকার প্রদান করা, দানশীলতা, বিনয় আর আর্থিক কুরবানী করা– এক কথায় অনেক উত্তম বৈশিষ্ট্য তাঁর মাঝে ছিল।

আলওয়ামী সিসা সাহেব বলেন, তিনি ১৯৮৯ সালে সিয়েরা লিওনের জামেয়াতুল মুবাশ্বিরীনে ভর্তি হন এবং ১৯৯১ সালে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। পড়াশোনায় বেশ ভালো নাম্বার পেয়েছিলেন। সব সময় ভালো নাম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতেন। সর্বপ্রথম যেখানে তার পদায়ন হয় সেখানেই পবিত্র কুরআন হিফয করা আরম্ভ করে দেন। নিজ উদ্যোগে তিনি কুরআন হিফয করেন। এরপর গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। সিয়েরা লিওনে কর্মরত সকল পাকিস্তানি মুবাল্লিগকে সেখান থেকে ফেরত চলে আসতে হয়। ডাক্তার সাহেব এরপর ফ্রি-টাউনে চলে আসেন। সেখানে মিশনারির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সেসময় সেখানকার ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এখান থেকে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে সিয়েরা লিওন জামা'তের জন্য কিছু জিনিসপত্র পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা এই বিষয়টি টের পেলে মিশন হাউসে হামলা করে। যাহোক, তারা (অর্থাৎ আহমদীরা) ঘরের সিলিংয়ের ভেতর লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু একজন, অর্থাৎ এই ঘটনা বর্ণনাকারী আহমদীকে সেই বিদ্রোহীরা ধরে ফেলে। তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলে, স্টোরের চাবি না দিলে তোমাকে হত্যা করব। স্টোরের চাবি ডাক্তার গুমাঙ্গা সাহেবের কাছে ছিল। যখন ডাক্তার সাহেব দেখলেন যে, পরিস্থিতি বেগতিক ও ভয়ংকর, তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে আসেন আর চাবি তাদেরকে দিয়ে দেন। কিন্তু যাহোক, তারা সেখান থেকে সামান্য কিছু নিয়ে চলে যায়।

খালেদ মাহমুদ সাহেব লিখেন, ডাক্তার সাহেব খিলাফতের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতেন এবং একজন নিতান্তই নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। প্রত্যেককে অনেক সম্মান করতেন। জামা'তের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। ছোটো-বড়ো সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। জামা'তের উন্নতির জন্য যে কেউ কোনো রকম পরামর্শ দিলে তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, জামা'তে এমন নিষ্ঠাবান থাকা উচিত যারা সদাসর্বদা জামা'তের উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে। আরও বলেন, অনেক কম মানুষই এমন দেখেছি যে ভুলকে ভুল আর সঠিককে সঠিক বলার সাহস রাখে। ডাক্তার সাহেব একজন নির্ভীক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। কথা বলার ধরন বেশ সুন্দর ছিল। সবার সাথে নম্রভাবে কথা বলতেন। সব কাজ ছেড়ে নামায আদায় করতেন। কেউ কড়া কথা বললেও তিনি নম্রভাবে সেটির উত্তর দিতেন আর সাথে এটাও বলতেন, একজন আহমদীর এরূপ কঠোর ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্য, সিয়েরা লিওনে নিজেদের একটি মাতৃসদন হাসপাতাল নির্মাণ করছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বেশ বড়ো প্রজেক্ট এটি। লাজনার প্রাক্তন সদর ডাক্তার ফারিয়া সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, তিনি নিতান্তই পরোপকারী একজন মানুষ ছিলেন। যখন লাজনার (নির্মানাধীন) মাতৃসদন হাসপাতাল পরিদর্শনে যাই তখন ডাক্তার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লাজনার হাসপাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান পরামর্শ তিনি প্রদান করেছিলেন। এরপর তিনি নিজেদের সরকারি হাসপাতালটি আমাকে ঘুরিয়ে দেখান। তার ভেতরে

মানবসেবার স্পৃহা আমাকে যারপরনাই প্রভাবিত করেছে। বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও একাধারে অগণিত রোগী তার নিকট আসত, কিন্তু তার চেহারায় মৃদু হাসি ও সহমর্মিতা ছাড়া আর কিছুরই দেখা মিলত না। তার মাঝে এক অদ্ভুত নিমগ্নতা ছিল যে, 'আমাকে আমার এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র নাগরিকদের সাহায্য করতে হবে।' যাহোক, তার ধারণা ছিল, যখন মাতৃসদন নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন সেখানে তার সেবা করার সুযোগ হবে। তবে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল।

তার স্ত্রী কাদিয়াতা বলেন, আমার স্বামী একজন পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। সর্বদা জামা'তকে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দান করতেন। তিনি চিকিৎসার জন্য সেনেগাল গিয়েছিলেন। সেনেগাল যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে বলেন, আমাদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান ও পূর্ণ আস্থা রয়েছে আর এটাই আমাদের সবকিছু। তাই এখন যা-ই হোক না কেন, বিচলিত হবে না। তার স্ত্রী আরও বলেন, মরহুম তার রোগীদের, বিশেষ করে আহমদী রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন এবং তাদের যত্ন নিতেন। এছাড়াও অন্যান্য অনেক গুণাবলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি মানুষজনের কাছ থেকে তার অনেক গুণাবলির কথা জানতে পারি। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি পাঁচ বেলা নামায আদায়কারী ছিলেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন আর কোনো ব্যত্যয় ছাড়া নিজের যৎসামান্য যে আয় হতো– তা থেকে হিসাব করে চাঁদা প্রদান করতেন।

প্রত্যেক বছর রমযান মাসে পবিত্র কুরআন কমপক্ষে একবার পুরোটা পাঠ করতেন এবং আমাকেও এর জন্য তাগাদা দিতেন। খুব ভালো স্বামী ও পিতা ছিলেন। আমাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার স্ত্রী, সন্তানদেরও হাফেয ও নাসের হোন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে তাহেরা নযীর বেগম সাহেবার, যিনি তাহেরা রশীদ উদ্দীন নামে পরিচিত ছিলেন; মুরব্বী সিলসিলাহ্ চৌধুরী রশীদ উদ্দীন সাহেবের স্ত্রী। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মূসীয়া ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা হযরত চৌধুরী গোলাম হুসায়ন সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল। একইভাবে তার নানা হযরত চৌধুরী গোলাম হায়দার ধারিওয়াল সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন।

পূর্বেই বলেছি তার বিবাহ চৌধুরী রশীদ উদ্দীন সাহেবের সাথে হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে তার বিবাহ মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র উপস্থিতিতে পড়িয়েছিলেন, আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া করিয়েছিলেন।

তিনি নিজের একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৮০ সালে আমি মজলিসে শূরায় যাবার টিকেট পাই; প্রতিনিধি হিসেবে যাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)ও শূরায়

উপস্থিত ছিলেন। মজলিসে শূরায় সাহাবীদের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক চলছিল যে, বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে কারা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত আর কারা নয়। তিনি বলেন, আমি ঘরে এসে খুব আফসোসের সাথে বলছিলাম, হে আল্লাহ্! যদি আমি সে সময় থাকতাম তাহলে আমিও সাহাবীয়াদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতাম। এরই মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ হয়। হুযূর আমার ঘরে ডানদিক ফিরে শুয়েছিলেন। আমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। হুযূর (আ.) অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার দিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে? আমি নিবেদন করলাম, হুযূর, আমি আপনার হাত-পা টিপে দিতে চাই। হুযূর নিজের ডানহাত দিলেন এবং আমি অনেক সময় ধরে টিপতে থাকলাম। এরপর হুযূর মাগরিবের নামাযের জন্য উঠানে গেলেন। আমিও বাহিরে উঠানে গিয়ে দেখতে পেলাম, অনেক ভিড়। লোকেরা জানালা ও চিলেকোঠার ওপর চড়েছে হুযূরকে দেখার জন্য। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কীভাবে জানলেন, হুযূর আমার বাড়িতে আছেন? তারা বলল, তোমার বাড়িতে আসলেন আর আমরা জানব না– এটা কীভাবে হতে পারে? ৩৭নং গলির বাসিন্দা তার কোনো বয়স্কা আত্মীয়া ছিলেন যিনি রুটি বানাচ্ছিলেন; (তিনি বলেন,) তাকে আমি ডাক দিয়ে বললাম, রুটি বানানো বাদ দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার বাড়িতে এসেছেন; তাকে এসে দেখুন। এরপর আমি বলি, শূরাতে বলা হয়েছিল, হুযূরকে কেউ দেখে থাকলে সে সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমার বাড়িতে হুযূর (আ.) দুদিন এবং একরাত অবস্থান করেছেন, আমি তো সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি! (তিনি বলেন,) আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ, যা প্রকাশের ভাষা আমার নেই!

তার পুত্র ডক্টর আলীমুদ্দিন আয়ারল্যান্ডে জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টও ছিলেন। বর্তমানে এখানেই বসবাস করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাতাকে অসংখ্য গুণাবলিতে ভূষিত করেছিলেন। তার মাঝে বিশেষত আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দোয়া কবুল হওয়ার গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। তিনি সত্যস্বপ্ন ও কাশ্ফের অভিজ্ঞতা রাখতেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও প্রেম ছিল যা সারা জীবন তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল আর যা তিনি নিজের সন্তানদের মাঝে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। শৈশবে আমাদের বাড়িয়ে যেসব বুযূর্গ ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হতো, অর্থাৎ মা যাদের ঘটনা বর্ণনা করতেন, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কোনো বড়ো মর্যাদা ছিল না, বরং বুযুর্গ নারীদের নাম বা খলীফাদের কথা বলতেন যা শৈশব থেকেই আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সেসব বুযুর্গের কাছে আমাদের মা নিয়মিত দোয়ার আবেদন জানাতেন। (এমনটি নয় যে, নিজে দোয়া করতেন বিধায় অন্যের কাছে দোয়া চাইতেন না। তিনি নিজেও অন্যের কাছে দোয়ার জন্য বলতেন।) তিনি বলেন, এগুলো ছাড়াও আমাদের মায়ের ব্যক্তিত্বে যেসব গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতো তা হলো, জামা'তের জন্য গভীর আত্মাভিমান। একবার

আমাদের বাড়িতে দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় জামা'ত সম্পর্কে অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করে। সাধারণত লোকেরা এ ধরনের কথা শুনে নীরব হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের মা তৎক্ষণাৎ কড়া ভাষায় উত্তর দেন। প্রথমে তাকে নিবৃত্ত করেন, তারপর তার ভুল সংশোধন করেন। বংশের সদস্যদের মাঝে এটি সর্বজনবিদিত বিষয় ছিল যে, তিনি যে–কোনো আত্মীয়ের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন, কিন্তু জামা'তের সম্মানে সামান্য আঁচড় লাগতে দিবেন না।

তার স্বামী চৌধুরী রশীদ উদ্দীন সাহেব জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। তবলীগের উদ্দেশ্যে দুবার আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানেই অবস্থান করেন এবং সন্তানদের উত্তম তরবীয়তের জন্য পূর্ণ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে, তার পুত্রদের অর্থাৎ আমাদের ভাইদের বন্ধুদের সম্পর্কেও তার জানা ছিল যে, তারা কারা এবং কী প্রকৃতির ছেলে। সবসময় তিনি বলতেন, এলাকার পুণ্যবান এবং পড়ালেখায় ভালো এমন ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত, যার-তার সাথে নয়। তারপর বলেন, একটি বিষয় যা আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, বেশিরভাগ সময় তার এমন নারীদের সাথে বন্ধুত্ব হতো যাদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজেই বলতেন, জগতপূজারীদের বৈঠকে আমি স্বাদ পাই না, বরং এমন লোকদের সাহচর্যে আমি আনন্দ পাই যারা সহজ-সরল এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগী।

তার মেয়ে আবেদা ও যুবদা সাহেবা বলেন, যখন থেকে আমরা বুঝতে শিখেছি, আমাদের মা'কে একান্ত ইবাদত পালনকারী, দোয়াকারী, মিশুক এবং পুণ্যস্বভাবের অধিকারিণী পেয়েছি। পরম বিনয় ও আহাজারির সাথে ইবাদত করতেন। নফল ও তাহাজ্জুদ পরম আন্তরিকতার সাথে পড়তেন। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিত তখনই তিনি নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে দীর্ঘসময় সেজদাবনত থাকতেন। ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে যখনই অভাব-অনটনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তিনি পরম ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল এবং সাহসিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে সেগুলো সহ্য করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছেই যাচনা করেছেন। তার হজ্জে যাওয়ারও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার এই বাসনাও পূর্ণ করেছেন। তিনি এগারোবার ইতিকাফ করেছেন। মেয়েরা বলেন, সমবেদনা জানাতে যে–সকল মহিলারা এসেছেন তারা বিশেষভাবে তার স্নেহ-ভালোবাসা, উত্তম বৈশিষ্ট্য এবং মিশুক স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় বইপুস্তক পাঠ করতেন। বিশেষ করে জীবনচরিত বিষয়ক বই খুবই আগ্রহ নিয়ে পাঠ করতেন। জুমুআর দিন ইবাদতের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মসজিদে গিয়ে নফল আদায় করতেন।

মরহুমার এক পুত্র সলীম উদ্দীন সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্; তিনি বর্তমানে নাযের উমুরে আম্মা হিসেবে রাবওয়ায় কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, আমাদের মা ওয়াকেফে যিন্দেগীর সহধর্মিণী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তার বিবাহ জালাল উদ্দীন শামস সাহেব পড়িয়েছেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া করিয়েছেন। এই বিবাহের ঘটনাও তার পিতা তাকে বলেছেন। তার পিতার অর্থাৎ

তাহেরা সাহেবার স্বামীর বিবাহ অন্য কোথাও হচ্ছিল। বিবাহের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। রাবওয়ার নুসরত মসজিদে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরি সাহেবের এই বিবাহের ঘোষণা করার কথা ছিল। সবাই এসেছিলেন। হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরি সাহেব অন্য সবার বিয়ে পড়ান কিন্তু তার বিয়ে পড়ান নি। তিনি বলেন, তুমি ওয়াকেফে যিন্দেগী, তোমার বিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পড়াবেন অথবা তাঁর (রা.) উপস্থিতিতে হবে। যাহোক, কিছুদিন পর যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল এবং হওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে অর্থাৎ কনেপক্ষ থেকে অস্বীকৃতি জানানো হয়। আর এরপর তার বিয়ে তাহেরা সাহেবার সাথে ঠিক হয় এবং এ বিয়ে খুবই বরকতপূর্ণ হয়েছে।

চাঁদার প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি নিয়মিত ছিলেন। কানাডার সেক্রেটারি মাল সাহেব একবার তাকে লিখেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, রেজিস্টার খুলে চাঁদার হিসাব করছি। এরই মাঝে তাহেরা রশীদ উদ্দীন সাহেবা সেখানে পাশে এসে বসে পড়েন। আমি বলি, আপনি এখন তাহরীকে জাদীদে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে দিলে আপনার নাম পাঁচ হাজারের রেজিস্টারে লেখা হবে। স্বপ্নে তিনি রাজি হয়ে যান। সে সময় তিনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পর স্বপ্নের কথা তাকে জানাই। আমার আশা ছিল, তিনি এমনটিই করবেন। যখন এই স্বপ্নের কথা তাকে বলা হলো তখন তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ হাজার ডলার তিনি এই খাতে প্রদান করেন। (আল্লাহ্ তা'লা ততদিনে তাকে স্বাচ্ছন্দের অধিকারী করে দিয়েছিলেন।) আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, এবং তার সন্তানদেরও তার সৎগুণাবলীগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)